Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 46–54
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্য প্রবাহ : ত্রিতীর্থের বিশেষ কিছু প্রযোজনা

দোয়েল চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদালয়
ই-মেইল: doyelchakraborty10@gmail.com

Keyword
সামাজিক নাটক, পত্রশুদ্ধি, অসমাপিকা, যদি এমন হতো, পীরনামা ও বিছন

Abstract
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান যে সব সংস্থাগুলি রাখে তাদের মধ্যে অন্যতম ত্রিতীর্থ। নাট্য সংস্থাটির বিশেষ কিছু প্রযোজনা যেমন-*পত্রশুদ্ধি, অসমাপিকা, যদি এমন হতো, পীরনামা* ও *বিছন* মূলত এই পাঁচটি নাটক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটিই সামাজিক নাটক। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন রকম দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেদিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা সমাজকে দেওয়া হয়েছে। *পত্রশুদ্ধি* একটি সাক্ষরতা বিষয়ক নাটক। এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা জীবনের একটি অঙ্গ এবং অক্ষর জ্ঞান না থাকলে মানুষকে কত সহজে বোকা বানানো যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। পুরো নাটকটি রাজবংশী ভাষায় রচিত। নাটকটি মিলনাত্মক ভঙ্গিতে শেষ করা হয়েছে। '*অসমাপিকা*' নাটকটি মালদার কথ্য ভাষায় রচিত হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর অবস্থান কোথায়। একটি সাধারণ মেয়ের সামাজিক দুর্দশার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। *যদি এমন হতো* এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে গল্পের ছলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে শিক্ষা দান করলে তা অনেক বেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। *পীরনামা* নাটকটিট সূর্যাস্ত আইনের সময়কার। যেখানে দেখানো হয়েছে জমিদারের জমিদারী রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য ব্যাকুলতা। অন্যদিকে পীর সাহেবের অল্প বয়সী বউকে খুঁজে না পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়া। এবং নাটকটির শেষে দেখানো হয়েছে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে গিয় একজন সদ্য যুবতী নারীর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় "বিছন" গল্পটির নাট্যরূপ দেন, যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভেদাভেদকে তুলে ধরা হয়েছে। ধনী-গরীব, জাতিবিদ্বেষ এবং ক্ষমতার মাথায় থাকা মানুষের সুদৃঢ় ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সভ্যতাকে কতটা চ্যালেঞ্জ করে তাই নাটকটির মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৈরি হবার পর এই জেলার নাটকের গতিপ্রকৃতির একটি ধারনা দেবার চেষ্টা করা হলো। যেখান থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্য প্রেমী মানুষেরা আজও নাট্যচর্চা থেকে দূরে সরে যায়নি।

Discussion

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরামের জমিদার পরিবারের অন্যতম সদস্য গোবিন্দ ঘোষ বালুরঘাট শহরে তাদের এক টুকরো জমি দান করেন। আর সেই দান করা জমিতে শহরের বহু নাট্য প্রেমী মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ১৯৬৯ সালে তরুন তীর্থ ও ত্রিশূল দুটো সংস্থা একত্রিত হয়ে ত্রিতীর্থ গড়ে ওঠে। নানা সুখ-দুঃখ আনন্দের স্মৃতি নিয়ে ধীরে ধীরে ৫০ বছর অতিক্রান্ত করে গেছে ত্রিতীর্থ। যুদ্ধে আক্রান্ত হওয়া দেশ গঠনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা বিঘ্নিত হয় নি। ১৯৯২ সালে এপ্রিল মাসে জেলা ভাগ হয়েছে। তারপরও ত্রিতীর্থের একটির পর একটি সফল মঞ্চায়ন দর্শকদের নজর কাড়ে। একুশ শতকে অজস্র বিনোদনের সম্ভার থাকা সত্ত্বেও থিয়েটারই পারে মানুষের সাথে সরাসরি সংযোগ ঘটাতে। নিয়মিত থিয়েটার চর্চার মধ্য দিয়ও মানুষের চিন্তার পথ প্রশস্ত হয়। ত্রিতীর্থের বিশেষ কিছু নাট্য প্রযোজনাযা দর্শকদের নজর কাড়ে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এরকমই বিশেষ কিছু নাটকের বিষয়বস্তু মঞ্চায়ন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। নাটকের উল্লেখযোগ্য অবদান সেই সময় মূলত বালুরঘাট নাট্য মন্দির, ত্রিতীর্থ, তূণীর, বালুরঘাট নাট্যকর্মী, সমবেত নাট্যকর্মী, গণনাট্য সংঘের শপথ শাখা, সমমন ইত্যাদি। এই দলগুলি মূলত নাট্যচর্চার প্রবহমানতা ধরে রেখেছে। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই ত্রিতীর্থ।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত একটি মৌলিক নাটক 'পত্রশুদ্ধি'। সাক্ষরতা বিষয়ক কাহিনী নিয়ে একটি মজার নাটক দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়। নাটকে রেশনের দোকানের কর্মচারী বলাই তার নিরক্ষর সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আরো একজন বিধবা মহিলার প্রেমে পড়ে, যে চিঠি লিখতে পারে, গান গাইতে পারে। প্রতি শুক্রবার করে একটি করে চিঠি পায় বলাই। বলাইএর স্ত্রী প্রশ্ন করে কে এই চিঠিটি পাঠায়। বলাই নির্দ্বিধায় বলে সব চিঠিগুলো উকিল পাঠায়। রেশনের মালিক পড়াশোনা না জানায় রেশন দোকানের সব চিঠি বলাইএর ঠিকানায় উকিল পাঠায়। এরকম সময় সাক্ষরতা মিশনের এক দিদিমণি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে আসে। কানন চিঠিগুলো দিদিমণিকে ঘটনাচক্রে দেখায়। দিদিমণি সরল সত্য কথা কাননকে জানিয়ে দেয় যে এগুলো একটিও উকিলের চিঠি নয়। কানন ভেঙে পড়ে, কান্নাকাটি করে। দিদিমণি কাননকে ভরসা দেয়। এবং গোপনে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে। কানন খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে নেয়। দিদিমনির বুদ্ধিতে কাননের হাতে একটি চিঠি আসে। এবং সেই চিঠিটি কানন বলাইকে দেয়। বলাই চিঠিটি পড়ে চমকে ওঠে। সেখানে কোন এক 'ম' কাননকে সন্ধ্যেবেলায় পুকুর পাড়ে দেখা করতে বলেছে। বলাই এর চিঠিটি পড়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। 'ম'টা কে? গোটা পাড়ায় 'ম' অক্ষর দিয়ে শুরু নাম গুলো খুঁজতে আরম্ভ করে এবং সেই পুকুর পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকতে শুরু করে কখন 'ম' আসবে। গ্রামের লোক চোর ভেবে তাকে মারতে শুরু করে। তারাই আবার আহত অবস্থায় বলাইকে বাড়িতে দিয়ে যায়। কাননের কষ্ট হয়। বলাইকে কানন জানিয়ে দেয় সে লেখাপড়া শিখে গেছে। একটি মিলনাত্মক ভঙ্গিতে নাটকটি শেষ হয়। কাহিনীকে ভিত্তি করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় রাজবংশী কথ্য ভাষায় রচিত নাটকটি দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। নাটক নির্মাণের বিশেষ জায়গা যেখানে কানন সাক্ষরতা মিশনের সেই শিক্ষাকর্মীর কাছে যখন লেখা এবং পড়া শিখছে, সেখানে নির্দেশকের পরিমিতিবোধ ও শৈল্পিক ভাবনা অনবদ্য দৃশ্য রচনা করে। আমরা দেখতে পাই শিক্ষাকর্মী মহিলা এবং কানন দুজনে বসে স্বরবর্ণ পড়ছে এবং লিখছে। আলো অস্তমিত হয়ে যায়। আবহে কাননের গলা পাওয়া যায়। 'আ'কার ও 'ই'কারযুক্ত শব্দগুলো সে পড়ছে। একটা সময় অন্ধকারের পরে আলো এলে দেখা যায় কানন উচ্চারণ করে পড়ছে। এবং দিদিমণি ব্যাগ থেকে বের করে দেয় একটি চিঠি। দু'জনেই হেসে ওঠে। দৃশ্যটি এখানে শেষ হয়। আরেকটি দৃশ্যে বলাই মনা বলে পরিচিত একজন ছেলেকে বাড়িতে ডেকে আনে। যে সময় মনার আসার কথা সে সময়ে বলাই ইঁদারার পারে লুকোয়। কানন দেখে ফেলে মনা আসে। কানন যত্ন করে মনাকে বসায় এবং ডিমের ওমলেট খেতে বলে। বলাই হা করে কাননের দিকে তাকায়। কানন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে মনাকে কটাক্ষ করে। মনা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড়ে পালায়। এবং কানন ডিমের প্লেট হাতে নিয়ে হাসিতে ঝড় তোলে। দৃশ্যটি অন্ধকার হয়। বিপুল হাসিতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ত্রিতীর্থের একটি বিখ্যাত মৌলিক নাটক 'অসমাপিকা'। অমল মিত্রের কাহিনীকে ভিত্তি করে মালদার কথ্য ভাষাকে ব্যবহার করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর অবস্থান কোথায়, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। একজন নারী সব ছেড়ে সংসার করতে আসে স্বামীর সাথে তার শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ির গঞ্জনা সইতে না পেরে যখন সে বাপের বাড়িতে চলে আসে, তখন সে তার জীবন দিয়ে বোঝে যে সে 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে গেছে। সুরেন হাজরা এক সাইকেল মেকানিক। সামান্য কিছু জমিজমাও আছে। সে গিরিজা এবং ননী সরকারের মেয়ে আশালতাকে বিয়ে করে ত্রিশ হাজার টাকা পণের বিনিময়ে। বিয়ের পরে ননী ও সুরেন হাজরা দু'জনে আশালতাকে গঞ্জনা দিতে থাকে। স্বাধীনচেতা আশালতা এটা মেনে নিতে পারে না। আশালতা প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করতে থাকে। নিত্য অশান্তি আশালতাকে শান্তি দেয়না। একদিন রাতে কেরোসিনের টিন নিয়ে এসে আশালতাকে পুড়িয়ে মারতে চায় তার শাশুড়ি ননী। সেই কেরোসিনের তেল কেড়ে নিয়ে শাশুড়ির গায়ে ছড়িয়ে দেয়। সুরেন হাজরা, আশালতার স্বামী নির্বাক থাকে। মা এবং বাবার প্রতি কোনো প্রতিবাদ করেনা। আশলতা সুরেনকে ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে আসে। শুরু হয় আশালতার জীবনে আরেক বিপত্তি। তার ভাই সুবোধের স্ত্রী বিমল আশলতাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এই নিয়ে নতুন সমস্যা তৈরি হয়। আশালতা বলে বাবার জমি সম্পত্তির ভাগ আমিও পাই। আমি তো আমার টাকাতেই খাচ্ছি। গিরিজা সরকার আশালতার বাবা কি করবে বুঝতে না পেরে অশান্তির জন্য সে আশনলতাকে দায়ী করে। ইতিমধ্যে সরকারি আমিন আশালতার চাইতে বেশি বয়সী হারাধন পালের সঙ্গে আশালতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হারাধন আসলে তাকে পাবার আকাঙ্খায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এবং সে আশালতাকে তার ভালোবাসার কথা জানায়। আশলতা বিয়ে করবে কিনা জানতে চায়। আশালতা সম্মতি প্রকাশ করে। আশলতা ত্রিশ হাজার টাকা পণ চায়। হারাধন নিমরাজি হয়। গিরিজা সরকার জানতে পেরে গোপনে হারাধনকে ত্রিশ হাজার টাকা দেয় আশালতাকে দেবার জন্য। আশালতা দেখে ফেলে এবং হারাধন পালের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং প্রতিবাদ করে বেরিয়ে যায়। রাত্রে বাবার কাছে প্রতিবাদ জানায়। ওর বাবা গিরিজা সরকার তার মৃত্যু কামনা করে। আশালতা এই পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নিজের অসহায় জীবনকে বিসর্জন দেয়।

আমরা নাটকের একটি জায়গায় দেখি হারাধন বসেছিল। আশালতা কে দেখে প্রেম নিবেদনের সিদ্ধান্ত নেয়-

"হারাধন: ও হ্যাঁ, আপনার বাবার সাথে দেখা করে কথাবার্তা পাকা করা যাবে।
আশা: বিহা হবে আপনার সাথ। পাকা কথা বাবার সাথ কেন?
হারাধন: মানে, তাইতো নিয়ম।
আশা: নিয়ম, এটাতো বেনিয়ম বিহা। হামার একবার বিহা হয়েছে। স্বামীকে ত্যাগ দিয়েছি হামি না কুমারী না বিধবা। বিহা করবো না এই ধন্দে। আপনি চুলে পাক ধরালেন একই নিয়মে বিহা কয়েন?
হারাধন: না
আশা: তাহলে পাকা কথা শুরু করি।
হারাধন: কহেন
আশা: বিহা যে করবেন টাকা পয়সা আছে?
হারাধন: আছে কিছু।
আশা: নগদ কত দেবেন?
হারাধন: কি কহেন?
আশা: বিহা যে করবেন, নগদ কত দিবেন?
হারাধন: নগদ আমি দিবো?
আশা: দিবেন না কেন? হামার বাপ ত্রিশ হাজার দিয়ে হামাক বেঁচেছিল সুখেন হাজরার বাপের কাছে হামার দাম ত্রিশ হাজার। টাকাটা হামাক আপনি দিবেন বিহার আগে। আমি বাপের টাকা ফেরত দিয়ে মুক্ত হব, তারপর বিহা। বুঝলেন?
হারাধন: (বিস্ময়ের চরম সীমায়) ত্রিশ হাজার টাকা!!

আশা: এক পয়সা ও কম হবে না।"[১]

ত্রিতীর্থ মালদার আঞ্চলিক ভাষাকে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করে নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এবং একটি মেয়ের সামাজিক দুর্দশার কাহিনী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এই আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে একজন নারীর অবস্থান কোথায়? দর্শক নিঃশব্দে নিজেকেই প্রশ্ন করে।

'যদি এমন হতো' হরিমাধব মুখার্জির লেখা ও নির্দেশনা এই নাটকটি বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ত্রিতীর্থ প্রযোজনা করে। নাটকটির মূল বক্তব্য চিরায়িত শিক্ষাব্যবস্থা নয়। সময়ের সাথে সাথে শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া উচিত খেলার মাধ্যমে এবং প্রকৃতির মধ্যে শিশু-কিশোরদের রেখে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ করে দেওয়া। তাদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটানো শিক্ষকদের কর্তব্য হওয়া উচিত। সময় অনেকটা পাল্টে গেছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার ও পরিবর্তনের দরকার। নাটকটির মধ্যে দিয়ে এই বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটির একটি জায়গায় মাস্টারমশাই দেখেছেন দুই ছাত্র স্কুলে না গিয়ে ডাংগুলি খেলছে। মাস্টারমশাই স্কুলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে। ওরা বলে যে ওদের চার দেওয়ালের মধ্যে এতক্ষণ বসে থাকা ভালো লাগেনা। সেটা ওদের অপছন্দ। এইবার মাস্টারমশাই ডাংগুলির সাহায্যেই ওদের অংক শেখাতে শুরু করে।

দৃশ্যটি শেষ হয়। আবহে নামতা বাজতে থাকে। আর একটি জায়গায় মাস্টারমশাই স্কুলের পাশে নদীর ধারে বিকেল বেলায় ছাত্রকে নিয়ে দাঁড়ান এবং ছাত্রকে চোখ মুছতে বলেন।

"ঘোষক: আচ্ছা এবার চোখ বোজ।
ছকু: কেন?
ঘোষক: একটা মজার খেলা খেলবো। বেশ চোখ বোজ। (ছকু চোখ বোজে) এবার কি দেখছিস বল তো?
ছকু: কিছু দেখা যাচ্ছে না। আঁধার খালি আঁধার।
ঘোষক: ভাব, ভাব তাহলে দেখতে পাবি। বলতো এবার কি দেখছিস?
ছকু: নদী।
ঘোষক: বা: নদীর জলের রং কেমন বলতো।
ছকু: ঘোলা। হইলদা।
ঘোষক: আর কিছু দেখছিস?
ছকু: হ্যাঁ।
ঘোষক: কি?
ছকু: নৌকা।
ঘোষক: নৌকাতে কেউ আছে?
ছকু: হ্যাঁ হ্যালা মাছ ধরছে।
ঘোষক: বা: এবার অন্য কিছু দেখ।
ছকু: কি দেখব?
ঘোষক: যা ইচ্ছে?
ছকু: একটা তালগাছ।
ঘোষক: কোথায়?
ছকু: পুকুর পাড়ে।
ঘোষক: পুকুর পাড়ের পাশে কি আছে?
ছকু: ফাঁকা মাঠ।
ঘোষক: মাঠে কিছু আছে?
চোখু: গরু।
ঘোষক: কটা
ছকু: তিন-চারটা।
ঘোষক: মাঠের পরে কি দেখছিস?

ছকু: একটা বড় টিনের বাড়ি।
ঘোষক: কার বাড়ি?
ছকু: ওটাই স্কুল।" [২]

শিক্ষক ও ছাত্র কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠেছে। *যদি এমন হতো* নাটকটির মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে শিক্ষা দিলে ছাত্ররা খুব সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে। এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহের 'বহিপীর' নামক কাহিনী অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'পীরনামা' নাটকটি রচনা করেন। তার নির্দেশনায় ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির কাহিনী সূর্যাস্ত আইন এর সময়কার। ঢাকার এক জমিদার তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে বজরায় পদ্মা নদীর মধ্যে দিয়ে কোন এক গ্রামে আসেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তার বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেওয়া। জমিদারি রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য। সেই সময় বজরার মধ্যেই তারা ছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় দেখেন নদীর ধারে অল্প বয়সী একটি মেয়ে (তাহেরা) বসে বসে কাঁদছে। তারা মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বজরায়। জানা যায় তার পিতা এক পীরের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। অক্লেশে সেই বৃদ্ধ পীর মেয়েটিকে বিয়ে করে। তাহেরা বিয়ের রাতেই পালায়। তারই সম্পর্কিত ভাইকে ভরসা করে পালিয়ে আসে। ছেলেটি মেয়েটিকে একা ফেলে পালিয়ে যায়। মেয়েটিকে আশ্রয় দেয় সেই জমিদার পত্নী এবং নির্ভয় প্রদান করে। সেই সাথে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি হয়। এবং সেই বৃষ্টিতে, ঝড়ে নৌকাডুবি হয়। মাঝি-মাল্লারা নৌকার যাত্রীদের উদ্ধার করে। এবং জমিদারের নির্দেশে বজরায় উঠিয়ে দেয়। মানুষটি বৃদ্ধ একজন পীর। জমিদার থেকে যত্ন করে, শুশ্রূষা করে, বজরায় পাশের ঘরে তাকে আশ্রয় দেয়। আলাপ পরিচয় গাঢ় হবার পর পীরসাহেব জমিদারকে বলে সে তার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছে। যে বিয়ের সময় পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়টি ভয় পায়। পীর জিজ্ঞাসা করার পর জমিদার বলেন- তিনি টাকা ধার করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তিনি একজন জমিদার। তার আসল উদ্দেশ্য হলো জমিদারি রক্ষা করার জন্য টাকা কর্জ নেওয়া। পীর সাহেব অনুমান করেছেন তার স্ত্রী এই বজরাতেই আছেন। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে পীর সাহেব বলেন যে উনি টাকা ধার দেবেন। পীর সাহেব জমিদারের ছেলের মুখে শোনেন একটি অল্প বয়সে স্ত্রীলোককে তারা আশ্রয় দিয়েছেন। পীর সাহেব আনুমান করেন সম্ভবত তিনি ওনার বিবাহিত স্ত্রী। তারা তাহেরকে এভাবে রাখতে পারে না। পীর সাহেব তার বিবাহিত স্ত্রীকে হেফাজতে চান। তার বিনিময়ে তাদের জমিদারি রক্ষার দায়িত্ব নেন। জমিদারের ছেলে বিদ্রোহ করে। সে তার জমিদার পিতাকে বলে তাদের জমিদারি দরকার নেই। জমিদারের ছেলে সব দায়িত্ব নেয়। জমিদার ও পীর কে বলেন মানুষ নিয়ে ব্যবসা আমি করিনা। পীর বুঝতে পারেন মেয়েটির সঙ্গে জমিদারের ছেলেটির একটি মানসিক সংযোগ হয়ে গেছে। পীর সাহেব মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিষয়টি স্বীকার করে। পীর প্রথমে ভয় দেখায় শরীয়ত আইন অনুসারে পাথর ছুঁড়ে তাদের মারা হবে। মেয়েটি এবং ছেলেটি চুপ করে থাকে। পীর জমিদারের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে সে মেয়েটিকে বিয়ে করবে কিনা? ছেলেটি সম্মতিসূচক উত্তর দেন। পীর সবাইকে সাক্ষী রেখে তার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক উচ্চারণ করে। সবাই খুশি হয়। দৃশ্য পরিকল্পনা দেখলে বোঝা যাবে অর্থ জোগাড় করতে না পেরে হাতেম আলী (জমিদার) ভেঙ্গে পড়ে তার জমিদারি দখল হবার ভয়ে।

"পীর: আলী সাহেব এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবেন না। হতাশ হবেন না। আল্লা দীন দুনিয়ার মালিক।তিনি যেমন মানুষের নিরাশ করেন। আবার আশার আলো দেখান। তিনি কারিয়া লন সত্য। কিন্তু সবটা লন না। কিছু দান করেন। আল্লাহর রহমতে ভরসা রাখুন, তার দোয়া প্রার্থনা করুন।
হাতিম: আইজ দুই মাস হইলো আল্লাহর দোয়া মাঙতাছি সর্বক্ষণ। আল্লাহ কি আর আসমান থিকা আমার মত বদ নসিবের লইগা বস্তা ভইরা তংখা পাঠাইবেন?
পীর: আলী সাহেব আল্লা কেন তংখা পাঠাইবেন? আল্লা ইচ্ছা করলে তার বান্দা কোন মানুষই আনার ফরমাইস পূরণ করিবেন।
হাতেম: কেন খোয়াব দেখান পীর সাহেব? ওইসব পুরানে কোরানে হয়, জীবনে ঘটে না।
পীর: খোয়াব দেখাইনা আলী সাহেব। আপনেরে ইসলামের গহীন গুহ নেক কহিলাম। এমনো তো হইতে পারে আচানাক কোন মানুষ আপনাকে এই বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল।

হাতেম: কি কন আপনি। আমার বোধগম্য হয় না।

পীর: বোধগম্য যাহাতে হয় তেমন করিয়া বলি ।খাজনা পরিষদের নিমিত্ত অর্থাৎ আপনার জমিদারি রক্ষার নিমিত্ত কত তংখা আশু প্রয়োজন।

হাতেম: গুইনা কি করবেন? আপনি কি আমার তংখা দিবেন?

পীর: আমি কোথা হইতে দিব? আমি খোদার ...জীবন কাটিল। তংখা বিষয়-আশয় আমার প্রবৃত্তি নাই। খোদার খেদমত করিয়া দিন কাটে।

হাতেম: তবে আর জিগান কেন?

পীর: ধরেন আমি যদি তংখার বন্দোবস্ত করি?

হাতেম: আপনি? কেমন কইরা? আমার কিছুই বোধগম্য হয় না।

পীর: আলী সাহেব আমি পীর- আল্লাহর রহমতে আমার হাজার মুরিদ। তারা সকলেই গরিব ফকির না, অনেক মুরিদ যথেষ্ট ধনবান-রইস আদমি। আমি চাইলে তাহারা তংখার বস্তা লইয়া হাজির হইবে- আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে। কিন্তু তারা হাতেম: কিন্তু তারা আমারে তংখা দিবে কেন?

পীর: আপনাকে দিবে না আমাকে দিবে, শর্ত ছাড়াই দিবে।

পীর: ঠিক তাই- যথার্থ বুঝুয়াছেন।

হাতেন: কেন দিবেন আপনি আমাকে এতগুলি টাকা? মেহেরবানী?

পীর: না মেহেরবানি না, শর্ত আছে।

হাতিম: শর্ত? কি শর্ত?

পীর: বসেন উত্তেজিত হইবেন না, বুঝিয়া বলিতেছি।আমার তিনি আপনাদের হেফাজতে। তিনি রাজি না হইলে এবং আপনারা অনুমতি না দিলে তাহাকে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। আপনারা তাহাকে আমার সহিত যাইতে রাজি করাইবেন- বিনিময় আমি আপনাদের তংখা দিয়েও সাহায্য করিব। আপনার মান ইজ্জত বজায় থাকবে। জমিদারি রক্ষা পাইবে।

হাতেম: দশ হাজার টাকা আপনি আমারে দান না কর্জ দিবেন?

পীর: দান হিসেবে আপনি গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইবো। যদি শরম হয় কর্জ বলিয়া ও লইতে পারেন। উল্লেখযোগ্য এই যে এই কর্জ পরিশোধের কোন শর্ত নাই। আপনি যখন খুশি যেমন খুশি, কি হইল? আমার প্রস্তাব কি আপনার অনুচিত দুরভিসন্ধি বলে মনে হইল।"[৩]

মুসলিম সমাজের যে প্রচলিত রীতি তা উপেক্ষা করে পীর সাহেব ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে গিয়ে একজন সদ্য যুবতী নারীর স্বাধীনতা কে স্বীকৃতি দেন। এবং হাতেম আলীর মানবিকতাকে সেলাম করেন। সেই জন্য তাহেরাকে পীরসাহেব তালাক দেবার পর হাতেম আলীর পুত্র হাসেম আলীর সঙ্গে সংসার করার পরামর্শ দেন। খোদেজা (হাতিম আলীর স্ত্রী) বলে ওঠে চুপচাপ দাড়িয়ে আছেন কেন? গরম গরম ভাত আর মুরগির মাংসের ব্যবস্থা করুন। নাটকের মধ্যে দিয়ে হাতিম আলি, তার স্ত্রী ও পুত্র উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে নাটক থেকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' গল্প অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভূদান আন্দোলনের সময়ের একটি দুর্বিষহ চিত্র ফুটে ওঠে। লছমান সিংএর অনুর্বর একটুকরো জমি, যাতে কোনো দিন কোনো ফসল হয়ন্ সেই জমিটি নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে গরম গরম ভাত ডাল আর আলুসেদ্ধ সে খেতে পাবে তার ওই জমিটি থেকে। লছমান সিংহ তার ভাই লটবর সিং দুজনের মধ্যে পারিবারিক রেষারেষি দুলনকে কিছু সুযোগ এনে দেয়। লছমান সিংয়ের কাছ থেকে অর্থের বিনিময় লটোবর সিংএর মোষকে গোপনে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে দুলন। আবার লটোবর সিংএর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তার পক্ষে কাজ করে। মূলত সে একজন ধান্দাবাজ ধূর্ত মানুষ যে কিনা বেঁচে থাকার জন্য এসব করে। পণ্যের জমির ফসল এনে দুই ভাইকে আলাদা আলাদা করে দেয়। দুলনের ছেলে ধাতুয়া লছমান সিং এর কাছে শ্রমিকের কাজ করে অন্যদের সঙ্গে। ধাতুযার এর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা সামান্য মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে দুদিনের জন্য কর্মবিরতি পালন করে। দুলন ভয় পায়। একটা দুশ্চিন্তা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। সে ধাতুয়াকে দূরে কোথাও চলে যেতে বলে। ধাতুয়া সিদ্ধান্ত নেয় শ্রমিকদের ছেড়ে কোথাও যাবেনা। ধাতুয়া স্ত্রী বাসনি দুলনকে বকাবকি করে ধাতুয়া কেন যাবে? দুলন আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। তারপর একদিন ধাতুয়া, করণ ও আসরাফিদের

খুঁজে পাওয়া যায় না। লছমান সিং অনেক আদর করে দুলনকে পূর্বোক্ত জমিটি দেয়। সঙ্গে শর্ত দেয় এই জমিটি কখনো যেন কেউ চাষ না করে। দুলনের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। দুলন রাত্রে খাবার খেয়ে সেখানে চলে আসে জমি পাহারা দেয়। দুলন বুঝতে পারে ধাতুয়া এবং করণকে হত্যা করে এই জমিতে পুঁতে দেওয়া আছে। দুলন কেমন যেন চুপ করে যায় কথা বলেনা-

> *"দুলন: ...বউ দুপা এগিয়ে যায় দুলনের দিকে। দুলনকে খুবই দুর্বোধ্য মনে হয়। খানিকটা ভয় পায়। থেমে যায়। বুঝতে পারে না কি করবে।দুলন এগিয়ে আসে ওর হাত কাঁপছে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। বুক ওঠানামা করে আলো স্তিমিত। প্রায় অন্ধকার দুলনকে ভয়াবহ দেখায়। আলো পড়ে বউয়ের কপালে। জ্বলজ্বল করছে তার কপালে সিঁদুরের টিপ। দুলন কম্পিত হাতে বউয়ের কপালের টিপ মুছে দিতে চাই। বউ চিৎকার করে ওঠে।*
>
> *বউ: মা-ই-য়া।*
>
> *শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। বাসনি অবাক, বিস্মিত, ক্রুদ্ধ বাসনির দুচোখে তীব্র ঘৃণা। বউ শাশুড়িকে ধরে ডুকরে কাঁদে।*
>
> *বাসনি: ইয়ে কা? তুমকা পিশাচ হো? বহুকা সোহাগ তুম মিটনা চাহাতে হো? তুম ক্যায়া হোসমে হো? কাহা হো গিয়া তুমে? (দুলনকে জোরে ঝাঁকুনি দেয়)*
>
> *দুলন: (বোবা কান্না ঠেলে বুকের ওপরে ওঠে। যেন আটকে যায়। মনে হয় দম আটকে আসছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার করে গলা থেকে বেরিয়ে আসে) ধা-তু-য়া-*
>
> *ছুটে বেরিয়ে যায় দুলন। ওর চিৎকার আকাশ-বাতাসে পরি ব্যপ্ত হয়।"* [৪]

নাটকের একটি দৃশ্য দেখা যায় লছমান সিং মাঝে মাঝে দেখতে যেতেন ওই জমিতে চাষ করছে কিনা? অনেকদিন পর একদিন গিয়ে দেখে জমিতে কেউ ধান চাষ করছে। প্রচন্ড রেগে যায় এবং বকাবকি করে দুলন এবং লছমানকে লাথি মারতে যায়। সেই সময় লছমান টিলার উপরে লাথি মারতে গেলে দুলন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লছমান সিংয়ের পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। লছমান সিং টিলা থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। লছমান সিংয়ের একটানা বন্দুকটা দুলন ছিনিয়ে নেয়। এবং লছমান সিংএর বুকে গুলি করে। রাত ভোর হয়। দুলন চিৎকার করতে থাকে টিলার উপর থেকে। যেন কবরগুলোর উদ্দেশ্যে বলে -

> *"করন বুলকি আসরাফি আজ ম্যায়নে কুছ কিয়া। আফশোশ ম্যায়নে কিসি কো বোল না সাকুঙ্গা, ম্যায়নে কিয়া কিয়া।মগর তুনে সব দেখা। করন তু দেখা, বুলাকি তু... যমনা আসরাফি ধাতুয়া তুনে সব কুছ দেখ্ লিয়া।তু সব মিলকর হামে কুছ্ বানায়া। কে ডরপুক কমজোর আদমি মেরেকো তু সবনে বাহাদুর বানা দিয়া। তু সব বানানা শক্ তা ইসিলিয়ে তু সবকো ম্যায় বিছন বানা দুঙ্গা। হাঁ হাঁ ধান পয়দা হোগা। তু সব বতে রহাগে বাড়তে রহোগে।*
>
> *দুলন আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়ায়। সে যেন একজন সাহসী মানুষ। এক আধা যোদ্ধা। সকাল হচ্ছে। পুব আকাশে সূর্যের ছটা। নাটক শেষ হয়।"* [৫]

মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্পে বিভিন্ন মানুষের ভেদাভেদ স্তর কে নির্দেশ করে ধনী-গরীব জাতিবিদ্বেষ এবং ক্ষমতায় থাকা মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে। *বিছন* নাটকেও সেটিই দেখানো হয়েছে। গরিব মানুষের পাশে দারাবার মত কেউ নেই সেটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকা এই মানুষগুলো কোন না কোন সময়ে বিদ্রোহ করে কখনো একক কখনো সম্মিলিতভাবে। মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনীতে এই বিষয়টি প্রকটভাবে রয়েছে। প্রবহমান নাট্যশিল্পের কাছে দায়বদ্ধ থেকে ত্রিতীর্থ প্রথম থেকে বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। যেহেতু এই প্রবন্ধটি অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৈরি হবার পর। ১৯৯২ সাল থেকে নাটকের গতিপ্রকৃতি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শতবর্ষের অধিক নাট্যচর্চায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের পর নতুন আধুনিক নাট্য প্রযোজনা ত্রিতীর্থেরই রয়েছে। ত্রিশূল এবং তরুনতীর্থ একসাথে মিশে গিয়ে বালুরঘাটে দর্শকদের আধুনিক নাটকের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে সেই জন্যই ত্রিতীর্থের নাট্য বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো। ত্রিতীর্থের পরে আরো ক'টি নাট্য সংস্থা তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা তূণীরের *পদ্মাবতী কথা* ও *জল পোকা*, বালুরঘাট নাট্যকর্মীর

শোক মিছিল, সমমনের *ছুনু মিয়ার কিস্ সা,* বালুরঘাট নাট্য আকাদেমি *তিন্নির মা* এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য *মুক্তির ডাক,* সমবেত নাট্যকর্মীর *জাস্ট* ও *সাঁনাই,* গণনাট্য শপথ শাখার *অন্য ঝুমুর* ও *রক্তকরবী*। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হওয়ার পরও বিভিন্ন সংস্থার নাট্য প্রয়জনা দেখলে বোঝা যায় প্রবহমান নাট্যচর্চায় কোন ছেদ পড়েনি। এখনো দর্শকদের রুচির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সেলফি সর্বস্ব সংস্কৃতিতে নাট্যদলগুলোর ক্ষেত্রে একটাই অসুবিধা যুবসমাজ সেভাবে এগিয়ে আসছে না। তবে এই খরা কাটবেই। কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলিকে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্য প্রেমী মানুষেরা নাট্যচর্চার থেকে আজও দূরে সরে যায়নি।

তথ্যসুত্র :

১। মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব, নাট্য সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ৭০০১০, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃষ্ঠা-৪৪৬
২। মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব, নাট্য সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, ৭০০০১০, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃষ্ঠা-১১৫
৩। মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব, নাট্য সমগ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা ৭০০০১০, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ ২০২১ পৃষ্ঠা–১৮৮-১৮৯।
৪। মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব, নাট্য সমগ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা ৭০০০১০, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ ২০২১ পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৬।
৫। মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব, নাট্য সমগ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা ৭০০০১০, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ ২০২১ পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৮।

আকর গ্রন্থ :

১। মুখোপাধ্যায়, হরিমাধবা, নাট্য সমগ্র (প্রথম খণ্ড) কলকাতা, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০২১
২। নাট্য সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০২১
৩। নাট্য সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০২১

সহায়ক পত্র পত্রিকা :

১. অধিকারী, মধুসূদন (সম্পাদক), দক্ষিণ দিনাজপুরের কথা, শারদ সংখ্যা ১৪১৩
২. গণনাট্য পঞ্চাশ বছর, ডিসেম্বর ১৯৯৩
৩. দেব, পীযূষ (সম্পাদক), দক্ষিণ দিনাজপুর বার্তা, শরৎ সংকলন ১৪২১
৪. নাট্য উৎসব ২০১৬, বালুরঘাট নাট্য মন্দির, দক্ষিণ দিনাজপুর
৫. পল্লবীত ২৫ বছর, ত্রিতীর্থ ১৯৬৯ থেকে ১৯৯৪, গোবিন্দ অঙ্গন, বালুরঘাট
৬. বালুরঘাট বার্তা সাপ্তাহিক, দেব পীযূষ কান্তি (সম্পাদক) সেপ্টেম্বর ১৯৮২
৭. বালুরঘাট বার্তা, লাহিড়ী মঞ্জুলা (সম্পাদিকা) শারদীয়া ১৪১৮
৮. ভট্টাচার্য্য, অজিতেশ (সম্পাদক), মধুপর্ণী, নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা ১৩৮২
৯. মজুমদার, ডঃ শিশির (সম্পাদক), নাট্যশালার শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯১৩

১০. মধুপর্ণী, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ১৩৮৪
১১. মধুপর্ণী, বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯
১২. মহন্ত, রাধামোহন, (সম্পাদনা), আত্রেয়ী, ১৫ জানুয়ারি ১৯৮২
১৩. মহন্ত, রাধামোহন (সম্পাদনা), আত্রেয়ী শারদীয়া, ১৩৮৯
১৪. শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্য মন্দির, ১৯০৯ থেকে ২০০৮ স্মরণিকা
১৫. শারদীয় প্রত্যূষ, তথ্যে তথ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর ১৪১৬
১৬. শারদীয় প্রত্যুষ, যারা স্মরণীয় যারা বরণীয়, ১৪১৭ একাদশ বর্ষ
১৭. শারদীয় প্রত্যুষ, ঐতিহ্যে ভরা দক্ষিণ দিনাজপুরের পর্যটন, ১৪১৮ দ্বাদশ বর্ষ